সংবাদ

তারিখ ...17.DEC.2017...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...১...

আনন্দঘন পরিবেশ : শিশুশিক্ষার মূল নিয়ামক

শরীফুল্লাহ মুক্তি

শিশুরারই জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রতিটি শিশুই সম্ভাবনাময়। আজকের শিশু দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা একদিন বড় হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। জন্ম দেবে এক গৌরবময় ও ঐতিহ্যপূর্ণ অধ্যায়। তাই শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। প্রয়োজন আনন্দঘন পরিবেশ; যেখানে শিশু নিজেকে নিজের মতো করে তৈরি করার সুযোগ পায়। শিশুর মন হলো মুক্ত বিহঙ্গের মতো, কোন কিছুতেই বাধ মানতে চায় না। সে নীড় বাঁধতে চায় আকাশে। তারা দীপ্ত প্রত্যয়ে এগিয়ে যাবে নতুন সভ্যতার দিকে– এটা আমাদের প্রত্যাশা। সুশিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু এটা কোন সহজ কর্ম নয়। আমাদের দায়িত্বশীল আচরণের জন্য একটি শিশুর জীবন সাফল্যের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারে। আবার আমাদের দায়িত্বহীন আচরণ বা অজ্ঞতার কারণে একটি শিশুর সারাটা জীবন গহিন অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হতে পারে। তাই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। শিশুর শিক্ষার ধরন বুঝে তার ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর শিক্ষার জন্য আনন্দঘন পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে সে শিশু একদিন কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হতে পারবে। ভীতিহীন পরিবেশে, আনন্দের মাঝেই সকল শিশু শিখতে চায়। কঠোর শাসন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিকূল পরিবেশ শিশুর শিক্ষাজীবনকে অনিশ্চয়তার পথে ঠেলে দেয়। মনের আনন্দই শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির মূল উৎস। তাই আনন্দঘন ও শিশুবান্ধব পরিবেশ ছাড়া শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো অসম্ভব। শিশুদের জন্য আনন্দমূলক শিক্ষা (Joyful Learning) নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। শিশুর শৈশব কলুষমুক্ত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত না হলে তার সোনালী ভবিষ্যৎ কিছুতেই আশা করা যায় না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'আনন্দহীন শিক্ষা, শিক্ষা নহে। যে শিক্ষায় আনন্দ নাই, সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথ আনন্দহীন শিক্ষা প্রসঙ্গে আরও বলেছেন– 'অন্যদেশের ছেলে যে বয়সে নবোদগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বন করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কুট গালি ছাড়া তাহাতে তার কোনরূপ মশলা মিশানো নাই।'

আনন্দমূলক শিক্ষা তথা Joyful Learning নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের শিক্ষা বা Education সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণভাবে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মানসিকতা, চরিত্র ইত্যাদির বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের নামই শিক্ষা। শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ শব্দ হলো 'Education'। অনেকের মতে 'Education' শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'Educare' থেকে। 'Educare' শব্দের অর্থ হচ্ছে লালন করা, পরিচর্যা করা, প্রতিপালন করা। এজন্য শিক্ষা শুরু হয় জন্মের পর থেকে আর চলে আমৃত্যু। আবার Joseph T. Shipley তাঁর Dictionary of word origins এ লিখেছেন– 'Education' শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'Edex' এবং 'Ducer-Duc' শব্দগুলো থেকে। এই শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো যথাক্রমে বের করা, পথ প্রদর্শন করা। অর্থাৎ শিশুকে আদর-যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার নামই হলো শিক্ষা। আবার প্রবাদে আছে– 'শিক্ষাই আলো'। কারণ শিক্ষা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান অন্ধকারকে দূরীভূত করে সমাজকে আলোকিত করে তোলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– 'শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন'। মহাত্মা গান্ধীর মতে, 'শিক্ষার লক্ষ্য হল দেহ, মন ও আত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সুসামঞ্জস্য বিকাশ সাধন'।

পূর্বে শিক্ষা বলতে বোঝানো হতো শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা বা শাসন করা। শিশুকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে বিদ্যা দান করার যে পদ্ধতি আমাদের দেশ তথা এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল, তাকেই শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদরা এ ধরনের শিক্ষাকে সংকীর্ণ শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন, শিশুর ওপর জোর করে বিদ্যা চাপিয়ে দেয়ার নাম শিক্ষা নয়। শিশুর গ্রহণোপযোগী আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা দানই হলো প্রকৃত শিক্ষা। অর্থাৎ আনন্দমূলক বা Joyful Learning শিক্ষাই হলো প্রকৃত শিক্ষা। Our current short definition of Joyful Learning is 'Engaging, empowering and playful learning of meaningful content in a loving and supportive community. Through the joyful learning process a student is always improving knowledge of self and the world.'

প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক জ্যা জ্যাক রুশো বলেছেন 'Education is the child's development from within' অর্থাৎ 'শিক্ষা হলো শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ।' শিশুর সামর্থ্য ও শক্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি আনন্দময় পরিবেশ। আবার এ পরিবেশ তৈরিতে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। শিশুর জন্য আনন্দময় পরিবেশ বলতে বোঝায় এমন একটি পরিবেশ– যেখানে শিশুর প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ঘরে-বাইরে সব মহলেই আজ তা উপেক্ষিত। তাই শিশুর প্রকৃত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রত্যেককেই যার যার অবস্থান থেকে শিশুর জন্য আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

শিশুর জন্য আনন্দময় পরিবেশ তৈরিতে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। পরিবার হলো প্রাথমিক ও মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার শাশ্বত বিদ্যালয়। পরিবার হবে শিশুর আনন্দমূলক শিক্ষার সুতিকাগার। শিশু প্রথম শিক্ষা লাভ করে পরিবার থেকে। তাই শিশুর পরিবারের পরিবেশ আনন্দময় ও শিক্ষা উপযোগী হতে হবে। শিশুবান্ধব ও আনন্দঘন পরিবেশে শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতের ব্যাপারে পরিবারের সকল বড় সদস্যের সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা থাকতে হবে। শিশুর পরিবারে থাকতে হবে পড়াশোনার পাশাপাশি বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। [illegible] মনে দাগ কাটতে পারে এমন [illegible] থেকে পরিবারের সদস্যদের [illegible] থাকতে হবে। এমনকি শিশুর সামনে গালমন্দ, ঝগড়া-ঝাটি, মিথ্যা কথা বলা, ছলনা করা, অনৈতিক ও নেতিবাচক আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের খেলার ছলে শিশুকে নতুন জিনিস শেখাতে হবে। প্রতিটি পরিবার যেন শিশুদের সুরক্ষা দিতে পারে– এটা নিশ্চিত করা জরুরি। আজকাল গতানুগতিক পড়ালেখার প্রতিযোগিতায় নেমে অনেক শিশুর শৈশবকাল মলিন হতে চলেছে। অনেক শিশুকে দেখা যায়, যে বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলায় মেতে থাকার কথা সে বয়সে ঘরের বারান্দা বা ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকছে। বাবা-মা হয়তো সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন তার শিশুটি শান্ত প্রকৃতির এই মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার মনের প্রফুল্লতা হারিয়ে ফেলেছে। চারপাশের পরিবেশটা তার কাছে নিরানন্দ হয়ে গেছে। খোলা আকাশের নিচে, নিজের মতো করে শিশুরা ছুটতে চায়; তাদেরকে ছুটতে দিতে হবে– থামিয়ে দিলে হবে না। সন্তানের সঙ্গে বাবা-মা'র দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। শিশু যেন অকপটে বাবা-মার কাছে তার সমস্যার কথা বলতে পারে। বাবা-মা হবেন শিশুর সবচেয়ে বড় বন্ধু।

শিশুর প্রতিভা বিকাশে সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক পরিবেশ দ্বারা শিশু ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। সুস্থ-সুন্দর সামাজিক পরিবেশ শিশুর মেধা ও মননশীলতা বিকাশে অত্যাবশ্যকীয় প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তাই সমাজ হতে হবে শিশু-বান্ধব ও শিশু-শিক্ষা উপযোগী। সমাজে সমবয়সী ও বড়দের কাছ থেকে শিশুর অনেক কিছু শেখার আছে। শিশুর বিদ্যালয়ে যাতায়াতসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজেরই দায়িত্ব। সমাজকে শিশুর চিত্তবিনোদনের জন্য খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। সমাজকে সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করতে হবে শিশুর মৌলিক চাহিদাগুলো। বিদ্যালয় থেকে কোন শিশু যেন ঝরে না পড়ে সে দিকে সমাজকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিটি শিশুর নিরাপত্তা, স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা, কাঙ্ক্ষিত আচরণ ও আনন্দমূলক শিক্ষাসহ সকল বিষয়ে সমাজের সব স্তরের মানুষকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

আনন্দমূলক পরিবেশে শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুর প্রতিভা বিকশিত করার ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য। শিক্ষক হচ্ছেন শিশুশিক্ষার একজন সুনিপুণ মিস্ত্রি; যিনি গঠন করেন শিশুর মানবাত্মা। একজন আদর্শ শিক্ষক সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন, 'সকলে মোরা নয়ন ফুটাই, আলো জ্বালি সব প্রাণে,/নব নব পথ চলিতে শেখাই, জীবনের সন্ধানে।/পরের ছেলেরে এমনি করিয়া শেষে/ফিরাইয়া দেই পরকে আবার অকাতরে নিঃশেষে।/পিতা গড়ে শুধু শরীর, মোরা গড়ি তার মন/পিতা বড় কিবা শিক্ষক বড়– বলিবে সে কোনজন।' শিক্ষক জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠ কারিগর। তিনিই পারেন শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে শিশুকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। শিক্ষক হবেন আদর্শের মূর্ত-প্রতীক। তাই তাকে হতে হবে নিবেদিতপ্রাণ; থাকতে হবে চরম ধৈর্য। শিশুর অবুঝ মন বোঝার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে তার। শিক্ষার্থীর মন কোমল, ভীতিপ্রদ এবং সৃজনশীল। একজন আদর্শ শিক্ষকের কাজ শিশুর মনের সকল ভীতি দূর করে সৃজনশীল কাজে তাকে সহায়তা করা। সব শিশু এক রকম নয়– তাই শিশুর রুচি ও মানসিক চাহিদা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। শিশুর মাঝে মুক্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিক্ষককে শেখার পরিবেশে নতুনত্ব আনতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষার বাইরে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক উন্নয়ন করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিশুদের নাম ধরে সম্বোধন করতে হবে। সঠিক উত্তরদান বা সুষ্ঠুভাবে শ্রেণীর কাজ সম্পাদনের জন্য শিশুদেরকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে। ভুল উত্তরদান বা সঠিকভাবে কার্য সম্পাদন না করতে পারলেও চেষ্টা করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে। স্কুল আঙিনায় বা রাস্তাঘাটে দেখা হলে শিশুদের সঙ্গে এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করতে হবে। অনুপস্থিত শিশুদের অনুপস্থিতির কারণ ওই এলাকার অন্য শিশু বা সহপাঠীদের কাছ থেকে জানতে হবে এবং প্রয়োজনে হোম-ভিজিট করতে হবে। কোন শিশু অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতে হবে। শ্রেণী-শিক্ষক বছরে কমপক্ষে একবার করে তার শ্রেণীর প্রত্যেক শিশুর বাড়িতে যাবেন এবং শিশু ও অভিভাবককে উৎসাহিত ও পরামর্শ দেবেন। কোন অবস্থাতেই অভিভাবককে শিশু সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ বা নেতিবাচক কিছু বলা উচিত নয়। শিশু ও শিশুর অভিভাবককে বোঝাতে হবে, শিক্ষক শিশুকে স্নেহ করেন এবং শিশুর মঙ্গল চান। শিক্ষককে হতে হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ; আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক পদ্ধতিগুলো জানতে হবে এবং সেগুলো শ্রেণীকক্ষে বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আনন্দমূলক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল বলেছেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির প্রাণশক্তি তৈরির কারখানা আর রাষ্ট্র ও সমাজ-দেহের সব চাহিদার সরবরাহ-কেন্দ্র। ওখানে ক্রটি ঘটলে দুর্বল আর পঙ্গু না করে ছাড়বে না।' বিদ্যালয়ের পরিবেশ হতে হবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুশোভিত, শ্রেণীকক্ষ থাকবে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ দিয়ে সাজানো-গোছানো, শ্রেণী-ব্যবস্থাপনা হবে শিশুবান্ধব। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যালয়কে ঢেলে সাজাতে হবে। বিদ্যালয় আঙিনা হতে হবে মনোরম ও শিশু উপযোগী। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে খেলার মাঠ ও পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী। থাকতে হবে পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, সম্পূরক পঠন সামগ্রী, শিশুতোষ সাহিত্য ও লাইব্রেরি। লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। চারু-কারু, সংগীতের মতো নান্দনিক কাজেও শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় থাকতে হবে বাহারি ফুলের বাগান। টোকাই, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য আলাদা শিখন সামগ্রীসহ বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাঁরা পিতৃ-মাতৃ স্নেহে আনন্দঘন পরিবেশে শিশুদের শিক্ষা এবং দীক্ষা নিশ্চিত করবেন। স্কুল যেন হয় শিশুর স্বপ্নের ঠিকানা; ঘুম থেকে উঠে তারা যেন স্কুলে আসার জন্য অস্থির হয়ে যায়– এ রকম পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুদের লেখাপড়ার বাইরে কোন কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। শিশুর বিবেক ও নৈতিক চেতনাবোধ জাগানোর বিষয়টি খুবই প্রয়োজনীয়। বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। এ সম্পর্কে সুইস বিজ্ঞানী জিন পিয়াজে বিভিন্ন বয়সের শিশু পর্যবেক্ষণ করে তাদের বিবেকবোধ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেন। তিনি মনে করেন, ৪ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশু বড়দের শাসন ও পরিচালনায় তাদের প্রদত্ত নিয়মকানুন ও মূল্যবোধের প্রতি সাড়া দেয় এবং এর ভেতর দিয়েই সে 'ভালো-মন্দ' সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। আর এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময় তার আদর্শবোধ গড়ে ওঠে। আবার ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সে শিশুরা মা-বাবা ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে শেখে। এ সময় তারা বিদ্যালয় ও সমাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত হয় এবং পালনে সচেষ্ট থাকে। সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিশুমনে বিচার-বুদ্ধির উদ্রেক হয়। কৈশোরোত্তর কাল অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়স প্রসঙ্গে পিয়াঁজে লিখেছেন, 'শিশু নিজের আচরণকে নৈতিক ও আদর্শের দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করে'। অর্থাৎ নিয়মের প্রতি বাধ্যতার প্রয়োজন অন্তর থেকে অনুভব করে। ফলশ্রুতিস্বরূপ শিশু স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। আর এ কাজগুলো আনন্দময় পরিবেশের মাধ্যমেই নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুরা নিষ্পাপ, ফুলের মতো। আজ আমাদের সমাজে যে শিশুরা বিপথগামী; চোর, ছিনতাইকারী, মস্তান, প্রতারক বলে পরিচিত, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে এক-একটি কাহিনী আছে। কাহিনীর অন্তরালে গেলে দেখা যাবে তাদের ভেতরেও ছিল শিশুসুলভ সরলতা, তারাও ছিল নিষ্পাপ। তাদের মধ্যেও ছিল অফুরন্ত সম্ভাবনা। পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে জীবনের জয়গানে আজ তারা পরাজিত। আজ তারা সমাজে ধিকৃত। আমাদের অসচেতনতা, অনুপোযুক্ত পরিবেশ ও আনন্দহীন শিক্ষার ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে তাদের জীবনে। অন্যদিকে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র এর প্রভাবমুক্ত নয়।

আনন্দহীন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। শিক্ষা আনন্দহীন হলে শিশু বিদ্যালয় তথা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া আনন্দহীন শিক্ষা শিশুমনে ভীতির সঞ্চার করে। ফলে এক সময় শিশু শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে। তারা সমাজবিরোধী, অসামাজিক, অনৈতিক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এটা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, পরকীয়া, বিয়ে-বিচ্ছেদ, সন্তানের প্রতি বাবা-মা'র অতিরিক্ত শাসন, অবহেলা, দারিদ্র্য, কুশিক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে শিশুর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়; শিশু হয় শঙ্কিত। শিশুর প্রতিভা বিকাশে আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য পরিবার, সমাজ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে যার যার অবস্থান থেকে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তবেই কেবল এর সুফল ভোগ করতে পারবে সমগ্র জাতি।

[লেখক : ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ]
ই-মেইল: ahmsharifullah@yahoo.com